প্রত্যাবর্তন

সৌরভ মণ্ডল

১

উফফ, কি সুন্দর লাগছে দেখ, দেখ – তুলসী আঙ্গুল তুলে পুবের আস্তাবলের মাঠের দিকে নির্দেশ করল। আমি চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম দূরে। সারা মাঠ জুড়ে উৎসব এর মেজাজ। আতস বাজির শব্দে কান পাতা দায়। আর হবে নাই বা কেন? একটু আগেই ভারতবাসী সেই বহু কাঙ্খিত ঘোষনা শুনে নিয়েছে রেডিও তে। জওহরলাল নেহরুর কন্ঠস্বরে সেই বহুপ্রত্যাশিত লাইন – “At the stroke of today's midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom⋯.” সেই নিশ্চয়তা যার জন্য প্রায় দু'শ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে ভারতবাসীকে। লক্ষ লক্ষ ছেলে নির্মম অত্যাচার সহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গেছে, পরিবার, সুখ-সাচ্ছন্দ্য সব বিসর্জন দিয়েছে। হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে চড়েছে কত সোনার ছেলে, কালাপানির অন্ধকারে কুরে কুরে মরেছে কত সম্ভবনাময় যুবা। অবশেষে সেই দিন এসেছে। ১৫ ই অগাস্ট। কাল সূর্যদয়ের প্রথম আলো পড়বে এক শৃঙ্খল মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে। আমি বললাম, “হ্যাঁ রে তুলসী, সব ইংরেজ ই কি দেশ ছেড়ে চলে যাবে?”

তুলসী তখন আমার ভাই মিলন এর সাথে জুটে পটকা ফাটাতে লেগেছে। আমার কথা শুনতে পায় নি। সে বলল, “ও দিদি এস, এস, রংমশাল জ্বালাই তুমি আমি মিলে এস না”। বলে প্রায় আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ছাদের ঐ দিকটায়। আনন্দ যে আমার কম হচ্ছে তা নয়। এই উৎসব এর পেছনে যে রক্তাক্ত ইতিহাস, তার প্রত্যক্ষদর্শী আমিও। কিন্তু এখন আনন্দ করতে ইচ্ছে করছে না। এখনি আনন্দ করতে ইচ্ছে করছে না। আমার হাতের মুঠোয় এখনও বন্দী আছে চিঠিটা, যে চিঠি আমাকে লেখা না, তবুও যেন আমার জন্যেই লেখা।

তবুও উপেক্ষা করতে পারলাম না তুলসীর অনুরোধ। ও যা মেয়ে, যতক্ষন না ওর সাথে না যাচ্ছি, কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা রংমশাল জ্বালাতেই হল। আমার হাতে রংমশাল দিতে দিতে তুলসী বলল, “সাবধান দিদি, ভাল শাড়ি। নষ্ট না হয়ে যায়”। তবে আমার কান পড়ে রইল, পেছনের রেলওয়ে স্টেশন এর দিকে। কোন ট্রেন এসে থামল কি? কেউ কি নামল সেই ট্রেন থেকে? সে কি নামল?

রংমশাল শেষ হলে তুলসী ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, “বুঝলে দিদি, কাল এখানে তেরঙ্গা ওড়াব। এই মিলন, কাল কিছু ইঁট জোগাড় করতে হবে বুঝলি। নাড়ু কে বলেছি, বাঁশবাগান থেকে বেশ লম্বা একটা বাঁশ কেটে আনতে। তার মাথায় বড় পতাকা টাঙাব। পুব দিক থেকে হাওয়া দিলে পতপত করে যখন উড়বে না, কি সুন্দর লাগবে বল? তাই না দিদি? ও দিদি কি ভাবছ অমন মুখ করে? ও দিদি -” আমার চমক ভাঙল তুলসীর কথায়। আজ যে কি হচ্ছে, বারবার মন চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। আমি বললাম, “হ্যাঁ, তা লাগবে। আমি নিচে যাচ্ছি রে, তোরাও আয়।“ বলে আমি নিচে চলে এলাম। পেছন পেছন কখন এঁচোড়েপাকা তুলসী টাও এসেছে। আমার হাতটা ধরে আস্তে আস্তে বলল, “অত ভেব না দিদি, বলেছে যখন ঠিক ই আসবে। আর কটা দিন আমাদের সাথে থাক না...” বলেই আমি ওর চুলের মুঠি যাতে ধরতে না পারি সেই জন্যই হয়ত, এক দৌড়ে নিজের ঘরে চলে গেল। পাগলি মেয়ে একটা। তুলসী আমার বোনের মত। ওর বাবা আমাদের খাজাঞ্চী ছিলেন। একবার আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। অনেকদিন আগের কথা। তখন ও বাবা জমিদার হন নি। দাদুই সব সামলাতেন। নিজের প্রানের বিনিময়ে আমাদের সম্পত্তি রক্ষা করেছিলেন ওর বাবা। ওর মা আগেই গত হয়েছিলেন। সেই ঋন শুধতেই কিনা কে জানে দাদু ওকে এনে রেখে দেন আমাদের বাড়িতে। সেই থেকে ও আমাদের সাথে আমার আর মিলন এর মতই মানুষ হয়েছে। আমাদের বাড়ির মেয়ে নয় বলে কোন তারতম্য করা হয়নি।

আমি ঘরে ঢুকলাম। সেই সন্ধ্যে থেকে সেজে গুজে বসে আছি। লাল বেনারসী। পায়ে আলতা পরেছি। সব গয়না গুলো আজ ঠিক ৩ বছর পর বের করে পরেছি। সেই দিনই শেষ পরেছিলাম যে দিন সে চলে গিয়েছিল। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, ১ টা ৩০। না আজ আর এলেন না মনে হয়। আমি কানের দুল খোলার জন্য হাত বাড়ালাম, এই দুলটা তারই দেওয়া। সবে খুলতে যাব, এমন সময়, কেউ যেন ফ্যাসফেঁসে গলায়

চিৎকার করে বলে উঠলো – “নেতাজী বাড়ি আছেন?” মিলন আমার ঘরে কি করতে এসেছিল, আমি বললাম, “এই, দেখ তো জানলার বাইরে কে?” ও দেখে এসে বলল, “ও তো পাগলা, ঐ আস্তাবলের মাঠের কাছে কদিন হয়েছে এসে রয়েছে। বদ্ধ পাগল”। “পাগল? তা স্বদেশী পাগল বল? ইস, আজকের মত দিনে...আহা রে হয়ত মার টার খেয়ে...” আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, “তুই এত রাত পর্যন্ত কি করছিস, এখন যা শুয়ে পড়। কাল ইস্কুল নেই?” মিলন আমার গলা জড়িয়ে বলল, “কাল আবার ইস্কুল কি? কাল তো ছুটি। এই দিদি শোন না, জামাইবাবু কি আজ আসবে? আমার জন্য খেলনা নিয়ে আসবে?” মিলন আমার থেকে ১২ বছরের ছোটো, আমি ওকে কি বলব? মাথা নিচু করে শুধু বললাম, “হুম, আসবে। তুই এখন যা।“

সেদিন রাতে আমি বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। আমাদের ছাদে পতাকা তোলা হয়েছে। সেই পতাকার মাথার ওপর চড়ে বসেছে আমার স্বামী। আমি নীচে দাঁড়িয়ে বলছি, “ও গো নীচে এস, ছেলেমানুষী কোর না, লক্ষ্মীটি। একটিবার নীচে এস”। কিন্তু সে কিছুতেই নামবে না। অনেকক্ষন ধরে এভাবে চলার পর হঠাৎ সবাই কে চমকে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, “বন্দে- ” তারপর মাতরম বলেই দিল এক ঝাঁপ, ছাদ থেকে একেবারে নীচে। আমি ত্রস্ত চোখে চেয়ে দেখলাম, আমাদের সদর দরজার সামনে পড়ে আছে ওর নিথর দেহ। ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। ভোরের আলো জানলার ফাঁক দিয়ে দেওয়ালে এসে পড়েছে। মনটা বড্ড খারাপ খারাপ লাগল, আর ঘুমোতে ইচ্ছে করল না। খানিকক্ষন এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লাম। এখনও বাড়ির কেউ ওঠে নি। সমস্ত পাড়াও সারারাত মোচ্ছব করার পর যেন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। সমগ্র ভারতবর্ষও যেন মুক্তির এক গভীর সুখনিদ্রায় মগ্ন। আমি সদর দরজা খুললাম।

২

“বন্ধুগন, আমার মুক্তিযুদ্ধের সহযাত্রীগন! আজ আমি তোমাদের কাছে একটি জিনিস চাইছি। আমি চাইছি তোমাদের রক্ত। রক্তই পারে আমাদের সৈন্যদের ক্ষরিত রক্তের দাম উসুল করতে। রক্তই পারে আমাদের স্বাধীনতার মূল্য দিতে। তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব”। – আমার সারা শরীরে যেন গরম আগুন ছুটছিল যেন। সারা শরীরে এক তীব্র উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। গায়ের লোম খাঁড়া হয়ে উঠেছিল। সেই মানুষটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল যাকে ১৫ বছর বয়স থেকে ঈশ্বরের ওপরে স্থান দিয়েছিলাম। যার সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে সবকিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপর কত খুঁজেছি তাকে। কোথায় না খুঁজেছি। আমাদের দুজনের লক্ষ্য এক ছিল বলেই বোধহয় ঈশ্বর আমার প্রার্থনা মকুব করেছিলেন আপন ভারতভূমী থেকে বহু দূরে, বার্মায়। সে সব যেন আজ বহুকাল আগেকার কথা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ধ্বনির মত শোনায় যেন কথাগুলো। একটা লাল বেনারসী, একটা তেরঙ্গা পতাকায় মোড়া আমার মা, আমার হারিয়ে যাওয়া বাবা, ঘরপালানো একটা সদ্য যুবকের পেছনে ধাওয়া করা পুলিশ এর হুইশল – সব কিছু যেন আজকাল মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যায়। কে আমি? আজকাল আর আমার ঠিক মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে নেতাজী কে। আমি কি আর কাউকে চিনতাম? আমার জন্য কি আর কেউ কখনও ছিল কোথাও? আমি ভাবতে পারি না, মাথার শিরাগুলো শুকিয়ে আসে, কিচ্ছু ভাবতে পারি না আমি, বা কোনকালে কি পারতাম?

আজকাল মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। বড় অদ্ভুত সব স্বপ্ন। আমি অনেক লোকের সাথে হেঁটে যাচ্ছি। তাদের কারো হাতে পতাকা, কারো হাতে কী সব লেখা প্ল্যাকার্ড। কেউ কোন কথা বলছে না। হঠাৎ একদল গোরা লোক ধেয়ে এল ঘোড়ার পিঠে চড়ে, এসেই এলোপাথাড়ি লাঠি চালাতে লাগল। আমি যার হাত ধরে ছিলাম, সে মনে হয় আমার বাবা। মারপিট শুরু হতেই তিনি আমাকে রাস্তার পাশের একটা দোকানের আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন, আর বললেন, “একদম আমি না ডাকা পর্যন্ত বেরবি না”। আমি ত্রস্ত চোখে চেয়ে দেখলাম, বাবা আবার গিয়ে ভিড়ে মিশলেন, এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে, চিৎকার করে বলে উঠলেন, “ইনকিলাব জিন্দাবাদ”, হঠাৎ পেছন থেকে এক লাঠি, বাবা মাটিতে পড়ে গেলেন, তক্ষুনি আমি শুনলাম, আকাশের দিকে ছোড়া গুলির আওয়াজ। এক ছত্রভঙ্গ জনতা, ছোটাছুটির মধ্যে বাবা তখনো মাটিতেই পড়ে ছিলেন। তারপর সেই গোরা সৈন্যগুলো বাবা কে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গেল কোথায়, সেই শেষ বাবাকে দেখা। সব স্মৃতিগুলো মাথার মধ্যে জড় হয়ে আছে। তবে সবসময় মনে পড়ে না। কখনও কখনও মনে পড়ে, কখনও কিছু দেখে, কখনও এমনি এমনি, কখনও বা স্বপ্নে। মনে

পড়ে লাল বেনারসী পরা এক করুন মুখ, চোখের কাজল যেন কান্নায় ধুয়ে গেছে, তারপর আর কিছু মনে পড়ে না কিছু, শুধু স্পষ্ট মনে পড়ে নেতাজী কে, তার প্রতিটা কথা আজও প্রতিটা রোম খাড়া করে দেয় আমার। কিচ্ছু ভুলিনি আমি।

আজকাল, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই, সেদিনকে কোথায় একটা ডকে চলে গিয়েছিলাম, সামনে একটা জাহাজ দেখে আমার প্রচন্ড মাথা যন্ত্রনা শুরু হল। মনে পড়ে গেল আমার সেই প্রথম সমুদ্রযাত্রার কথা। বাড়ি থেকে পালিয়ে বার্মাগামী জাহাজে চেপে বসা। চারিদিকে আদি অন্তহীন সমুদ্র, আর আমি চলেছি এক দুর্বার ডাকের উদ্দেশ্যে। পরিনাম এর চিন্তা নেই, পিছুটান নেই, জাহাজ যখন নোঙর তুলল, আমিও যেন সব কিছু ছুড়ে ফেলে দিলাম ঐ বন্দরের উদ্দেশ্যে। এখন একটাই লক্ষ্য। সেই মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ ও দেশমাতৃকার স্বাধীনতা।

সেদিন একটা মুদিখানার দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা অতীনদার দোকান না? একটা বন্দুক পাওয়া যাবে? "আবার পাগলটা এসেছে, এই পাগলা যা, বেরো এখান থেকে। মুদিখানার দোকানে বন্দুক খুঁজতে এসেছে। যত্তসব পাগল।" বলে আমাকে জোরে একটা ঘাড়ধাক্কা দিলে, আমি এসে পড়লাম, রাস্তায় একটা ফিটন গাড়ির সামনে, ভেতরে কে? ব্রুক্স না? কোথায় আমার বন্দুক, দাও সেদিন লাগেনি আজ ঠিক জায়গায় লাগাবই। কিন্তু কিছু করার আগেই দু টো লোক ঠেলে আমায় রাস্তার বাইরে নিয়ে এল। সশব্দে হর্ন বাজিয়ে চলে গেলে ব্রুক্স। আবার। আমার খুব রাগ হল, কেন পাওয়া যাবে না? অতীনদার দোকান ছিল না এটা? এই দোকানেরই চালের বস্তার নীচে লুকিয়ে রাখতাম পিস্তল। আমাদের পিস্তল। পেছনের আমবাগানের ভেতর চলত লক্ষ্যভেদ প্র্যাকটিস। সবথেকে ভাল টিপ আমার। অতীনদা বলেছিল তুই পারবি। তোর ওপর অনেক ভরসা রে। হতাশ করিস না। ব্রুক্স এর অত্যাচারে তখন এলাকার সবাই অতিষ্ট। আমাদের লীডার অতীনদার তালিমে জোর কদমে চলছে ব্রুক্স হত্যার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি।

সেদিন একটা পার্টি থেকে সস্ত্রীক বাড়ি ফিরছিল ব্রুক্স। তার সেই ফিটন গাড়ি চড়ে। প্ল্যান ছিল, সুবিমল সাইকেল নিয়ে ধাক্কা মারবে গাড়িতে। আটকে যাবে রাস্তা সেই ফাঁকে সোজা গাড়ির সামনে এসে গুলি চালাব আমি। ৩ টে গুলি একদম বুকের বাঁদিকে, মেরেই সোজা পাঁচিল টপকে পগারপার। কভার করবে অতীনদা স্বয়ং। কিন্তু আমাদের প্ল্যানে গলদ ছিল। পার্টি তে প্রচুর মদ খেয়ে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে আসছিল ব্রুক্স। ধাক্কা মেরে টাল সামলাতে পারেনি সুবিমল, ফলে মাটিতে না পড়ে পড়েছিল ব্রুক্সের ঘাড়ের ওপর। আমি সামনে এসে গুলিও চালাতে পারছিলাম না। কারন ব্রুক্স এর শরীর তখন ঢেকে রয়েছে সুবিমল। এদিকে চেঁচামেচিতে কিছু গোরা পাহারাদার ছুটে চলে আসে। ফলে প্ল্যান বানচাল করে ছুটে পালাতে হয় আমাদের। সুবিমল ধরা পড়ে যায়। স্বেচ্ছায় ধরা দেয় অতীনদা। এরপর আমাদের দলটাই ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আমি আশা ছাড়িনি। ছাড়িনি সংগ্রাম ও। একদিন জোর করে বাড়ি থেকে বিয়ের ঠিক করে। আমি অনেক না করেছিলাম। শোনেনি। কোন এক গ্রামের জমিদারের নাতনি। কিন্তু আমার তখন বিয়ে করার মানসিকতাই নেই। তবুও কেউ শোনেনি। অগত্যা বেছে নিতে হয়েছিল অমোঘ পথ। বিয়ের রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, একটা চিঠি ছেড়ে আসা, "এই বিবাহে আমার মত কোনকালেই ছিল না। আমি মন প্রান সঁপে দিয়াছি দেশমাতৃকার চরণে। বিপ্লব চলাকালীন কোনমতেই কোন সাংসারিক বন্ধনে বন্দী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী আমার সহধর্মীনির প্রতি। দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিনি আমি আবার ফিরিয়া আসিব। কথা দিলাম"। ব্যস, তারপর বার্মাগামী জাহাজ, নেতাজী এবং সংগ্রামের শেষ কয়েকটা দিন। সব আমার স্মৃতি তে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু কথা যেন অগোছাল হয়ে যায় আজ। কেউ যেন বুঝতে চায় না আমায়। না কি পারে না। কিন্তু আমি যেখানে যাই সেখানে বিপ্লব কেন হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায়। কেন? অতীনদার নেতৃত্বে হয়নি। কিন্তু নেতাজী? তিনি কেন এমন করলেন? আজও মনে আছে, এক বছরে আমরা অনেকে ফ্রন্ট জিতে নিয়েছি। দুর্বার গতিতে এগচ্ছি ভারতের দিকে। জয় প্রায় নিশ্চিত। বুকে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত মশাল, আর সামনে আদর্শের মত এক মহাপুরুষ, পেছনে আমরা, জীবন দেব তবুও দেশ কে মুক্ত করব। তিনিই তো বলেছিলেন, "দেশের স্বাধীনতা কে চাক্ষুষ দেখার ইচ্ছা আমাদের করা উচিৎ নয়। বরং আমাদের প্রান বিসর্জন দেওয়া উচিৎ যাতে দেশ বাঁচতে পারে"। হ্যাঁ, শহীদ হওয়ার ইচ্ছে তখন আমাদের শিরায় উপশিরায় বইছে। সবই তো ঠিক ছিল তবে কেন তিনি এভাবে হারিয়ে গেলেন? কোথায় গেলেন? এই অসমাপ্ত যুদ্ধ ছেড়ে? তিনি কি আড়ালে থেকে লড়াই করলেন শেষ কদিন? হয়ত তাই? নইলে দেশ স্বাধীন হল কি করে? আজই তো সেই দিন। আজ রাতেই তো সেই মহোৎসব। কিন্তু আজকের দিনে কেউ তাকে ভুলে যায়নি তো?

আমি ভুলিনি। আমি কিছুই ভুলিনি। ভুলিনি আমি যে আমার এক জায়গায় ফেরার কথা ছিল, আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু কার কাছে সেটাই এখন মনে পড়ছে না। খুব চেষ্টা করলাম, পড়ল না। দূরে একটা মাঠে বাজি ফাটছে। আনন্দ, খুব আনন্দ। কত আশা, কত বলিদান, রক্ত পেরিয়ে এই দিন এসেছে। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "বন্দেমাতরম"। আতসবাজির কলকোলাহলে আমার আওয়াজ ঢাকা পড়ে গেল। শুধু

দূরের একটা দেওয়াল আমার কথার জবাবে একই কথা বলে উঠল। দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ির ছাদে দুটো মেয়ে আর একটা বাচ্চা ছেলে বাজি ফাটাচ্ছে। আলোয় একটা মুখ দেখে আমার মাথা যন্ত্রনা আরো বেড়ে গেল। কে এ? আমি একে কোথায় দেখেছি? আমার সাথে এর কি কোন সম্পর্ক আছে? মনে পড়ছে না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না। খুব কষ্ট হচ্ছে। মাথার শিরা গুলো শুকিয়ে ফেটে আসছে যেন। আমি বসে পড়লাম গাছতলায় মাথা চেপে ধরে। আমার চকিতে মনে পড়ল এক দৃশ্য- সৈনিকের বেশে আমি হাঁটছি এক পথ দিয়ে আর আমার মাথায় পেছন থেকে পড়ল এক লাঠির বাড়ি। তারপর থেকেই আমার চিন্তাভাবনা গুলো কেমন জট পাকিয়ে যায়। সেদিন যেমন যন্ত্রনা হয়েছিল, আজও তেমন হচ্ছে।

অনেক্ষন এভাবে বসে ছিলাম। সব বাজি ফাটান থেমে গেছে। বাড়িটার লোকগুলও নীচে নেমে গেছে বোধহয়। আমাকে বাড়িটা যেন টানছে। খুব চেনা মনে হচ্ছে বাড়িটাকে। আমি এগিয়ে গেলাম বাড়ির দিকে। দরজা বন্ধ। এটা কি নেতাজীর বাড়ি? তিনি কি ভেতরে আছেন? আমি বাড়িটার চারদিকে ঘুরতে লাগলাম। জানলার কাছে একটা মেয়ে বসে আছে লাল বেনারসী পরে। আমি জানলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম “নেতাজী বাড়ি আছেন?” পর্দা টাঙ্গান, ভাল করে দেখা যায় না। কেউ একটা এসে আমাকে যেন আবার পাগল বলল। আমার এবার খুব রাগ হল। এই পাগলরা না থাকলে কি করে স্বাধীনতা পেতিস হারামজাদা? জানিস যখন পাশে থাকা বন্ধুটা গুলি খেয়ে শুয়ে পড়ে তখন কেমন লাগে? বরফের চাঁই এর ওপর শুয়ে সপাং সপাং করে চাবুক খেতে কেমন লাগে জানিস তোরা? জানলে, দেখলে বুঝতিস। সব অপগন্ডের দল। বাজি ফাটাচ্ছে!

আমি পেছনের জানলার কার্নিশ বেয়ে ছাদে উঠে এলাম। শুনশান ফাঁকা ছাদ। দূরে আকাশে একটা হেডলাইটের মত চাঁদ জ্বলছে। যেন দেবতা সারাপৃথিবী তে টর্চ মেরে দেখছেন, সব ঠিকঠাক আছে কি না। হা হা, আমার খুব হাসি পেল। স্বাধীনতা। অবশেষে স্বাধীন ভারত। কিন্ত আমি কি করছি এখানে? বাবা নেই। নেতাজী নেই। আমার সহকর্মী সেসব যোদ্ধারা কেউ নেই। তবে আমি এখানে কি করছি? তখনি আবছা আলোয় দেখলাম আমার মাকে। সারা গায়ে তেরঙ্গা পতাকা জড়ানো। ডাকছেন আমাকে দুহাত বাড়িয়ে ঐ তো ছাদের ঐ কোনটায়। আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু একি মা পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? কোথায় যাচ্ছ মা? আমাকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে মা। তোমাকে তো কিছুতেই হারাতে পারব না। আমি ছুটে গেলাম ছাদের কিনারায়। দেখলাম মা নীচে দাঁড়িয়ে ডাকছে। দুহাত বাড়িয়ে। আমাকে যেতেই হবে মায়ের কাছে। ওখানেই আমার সুখ, আমার মুক্তি। আমি ঝাঁপ মারলাম মায়ের কোলে।

এখন আর মাথা যন্ত্রনা করছে না। সমস্ত চিন্তা যেন ঐ বহমান রক্তস্রোতের সাথে ধুয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। অতল ঘুমে তলিয়ে যাবার আগে আমি শেষবারের মত শ্বাস টেনে চিৎকার করে উঠলাম “বন্দে-”, আমার নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল, “মাতরম”।
